ভাষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদা-স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ*

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

প্রারম্ভিক কথা

স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই বলেছেন "অনন্ত ভাবময় ঠাকুর"। 'ঠাকুরের ভাব' অর্থাৎ ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাব। কারণ, তাঁরা অভেদ। কাজেই ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবাদর্শ এক মহাসমুদ্র। কোথায় যে তার শুরু আর কোথায় যে এর শেষ, তা চিহ্নিত করা দুষ্কর ব্যাপার। তবু আমরা এই স্বল্প পরিসরে দু-একটি প্রধান ভাবকে চিহ্নিত করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। সারা পৃথিবী এখন জানে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ হচ্ছে সমন্বয়ের ভাবাদর্শ। অনেক বছর আগে ১৯৭২ সালে গোলপার্কের Institute of Culture-এ সৌদি আরব থেকে একটি প্রতিনিধিদল এসেছিলেন। তখন Institute-এর অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য পূজনীয় স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী মহারাজ। তিনি Institute of Culture-এর প্রতিষ্ঠাতাও। সেসময়ে Institute of Culture-এর সর্বোচ্চ তল পাঁচতলায় একটি Chapel ছিল। সেটিকে বলা হতো Universal Chapel বা সর্বজনীন উপাসনালয়। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ এবং যীশুখ্রীস্টের তিনটি মূর্তি ছিল। ঐ পর্যটকেরা অধ্যক্ষ মহারাজকে বললেন ঃ "স্বামীজী, আপনাদের এই সর্বজনীন উপাসনালয়ের ভাবনাটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে, আপনাদের আদর্শ ও চিন্তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কেবলমাত্র এই তিনজনের মূর্তিই কেন এই উপাসনালয়ে রাখা হয়েছে? কেবলমাত্র এই তিনজনকে দিয়েই কি পৃথিবীর সব ধর্মের, সব পথের পথিকদের কথা বলা হলো ? এই তিন জনকে রাখলেই কি সেটি `Universal Chapel' (সর্বজনীন উপাসনালয়) হয়ে যাবে ?" স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী মহারাজ একজন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি এই কথা শুনে চুপ করে রইলেন। কারণ, কথাটি তো ঠিকই। তিনটি ধর্মের তিনজন আচার্যের ছবি রেখে কি আমরা কোন উপাসনালয়কে সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন বলতে পারি? কিন্ত সমস্যা হলো--পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব দিতে গেলে আমরা কোথায় তা শুরু করব আর কোথাই বা শেষ করব ? আর কোথায় এত বড় জায়গাই বা পাওয়া যাবে? সৌদি আরবের প্রতিনিধিরা বললেনঃ"স্বামীজী, এব্যাপারে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে। আপনারা শুধুমাত্র আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিই রাখুন। কারণ. তিনিই তো বলেছিলেন--'যত মত তত পথ'। আধুনিক পৃথিবীতে সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন। তাই আমাদের পরামর্শ এই যে, যদি মূর্তি বা ছবি রাখতেই চান তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবিই বিশ্বজনীন উপাসনালয়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিই উপাসনালয়ের সর্বজনীন ভাবটিকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলবে। অন্য কারও মূর্তি বা ছবি রাখার কোন প্রয়োজন পড়বে না। ইসলামধর্ম তো মূর্তি বা ছবি পূজায় বিশ্বাস করে না, তবু বিভিন্ন ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন মূর্তি বা ছবি রাখতেই হয় তা হলে শ্রীরামকৃষ্ণই হবেন আদর্শ।" পরবর্তীকালে তাই করা হয়েছিল। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সঙ্গে সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবিও রাখা হয়। কারণ, আমরা মনে করি , তাঁরা তিনজন অভেদ, এক ও অভিন্ন। তাঁরা 'তিন-এ এক, এক-এ তিন।' এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণেরই, ভিন্ন এক প্রসঙ্গে বলা। যাই হোক, ইনস্টিটিউট অফ কালচারে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর ছবি প্রতিষ্ঠা ১৯৭৬ সালে পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের অধ্যক্ষতার সূচনাপর্বে ।। 'Universal Chapel' কথাটি তখন আর লেখা থাকল

না। শুধু 'Chapel' কথাটি থাকল। ১৯৭০ সালে নকশালদের আক্রমণে এই উপাসনালযটি পুড়ে গেছিল। পর্দা, কার্পেট, সিংহাসন, মূর্তি সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিটির কোনও ক্ষতি হয়নি। এটি একটি অলৌকিক ঘটনা, না কাকতালীয় তা বলতে পারব না, কিন্তু ঘটনাটি সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রধান বার্তা হচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু আলোচনা, কিছু গবেষণা, কিছু চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে আমার নিজের ধারণা হয়েছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র সর্বধর্মের সমন্বয় করেননি। তিনি সর্ব মতের, সর্ব পথের, সর্ব কর্মের, সর্ব বর্ণের, সর্ব ভাবের, সর্ব চিন্তার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। ধর্মের সাথে কর্মের সমন্বয় সাধনও তাঁরই অবদান। ঐহিক ও পারত্রিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক-- এই দুয়ের সমন্বয়সাধনও তাঁর এক মহান বার্তা। ভগিনী নিবেদিতার সেই বিখ্যাত মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্যঃ ''Henceforth there was no distinction between the sacred and the secular''— এখন থেকে পারত্রিক ও জাগতিক এই দুয়ের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রইল না।

কথাগুলি ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর 'Complete Works'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী পার্ষদ ছিলেন শ্রীম। আমরা অনেকেই তাঁকে 'মাস্টারমশাই' বলে জানি। একদিন তিনি বলরাম মন্দিরে এসেছেন। তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ কলকাতার বলরাম মন্দির-এ অবস্থান করছেন। শ্রীম বলরাম মন্দির-এ এসে দেখলেন ব্রহ্মানন্দজী ভাবতন্ময় হয়ে বসে আছেন। তিনি মাস্টারমশাইকে দেখে বললেন-"মাস্টারমশাই, আমার মনে একটি কথা আসছে। ঠাকুর এবার তাঁর মর্ত্যলীলায় এসে একটি সেতুবন্ধন করে দিয়ে গেছেন। স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে, ধর্ম এবং কর্মের মধ্যে সেতুবন্ধন বা মেলবন্ধন করে দিয়ে গেছেন।"

অর্থাৎ শুধুমাত্র সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তাবাহী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বললে তাঁকে ছোট করে ফেলা হবে, তাঁর ভাবকে সীমায়িত করে ফেলা হবে। এক সর্বব্যাপী মিলনের ভাব দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কথাটি বলে গেছেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-র মধ্যে আমরা এক ত্যাগী সন্তানের সঙ্গে শ্রীমায়ের কথোপকথনের বর্ণনা পাই। সেখানে ত্যাগী সন্তানটি বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান ভাব হলো সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব। এই ভাবটি স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। শ্রীশ্রীমা সাধারণ অর্থে শিক্ষিতা ছিলেন না। তিনি কোন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেননি। 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের প্রথম ভাগ, হয়ত-বা দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত তিনি পড়েছিলেন। এরপরেই তাঁর হাত থেকে হৃদয় বই কেড়ে নিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের পড়াশুনার ইচ্ছা খুব প্রবল থাকায় তিনি আবার পয়সা জোগাড় করে 'বর্ণ পরিচয়' কিনিয়েছিলেন। কিন্তু এর বেশি তিনি এগোতে পারেননি। এজন্যই মায়ের সর্বপ্রধান এবং সর্বাধিক প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থের লেখক স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ লিখেছেন, শ্রীশ্রীমা পড়তে পারতেন, কিন্তু লিখতে পারতেন না। এটিই বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ধারণা ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের সাথে খুবই অন্তরঙ্গভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা । তিনিও তাঁর 'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে একই কথা বলছেন। বহুকাল পরে 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের প্রস্তুতির সময়ে আমাদের হাতে একটি পোস্টকার্ডে লেখা চিঠি আসে । এই চিঠিটির পুরোটাই শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে লেখা । চিঠিটি ও তার আলোকচিত্র 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিটি প্রমাণ করে যে, সাধারণ অর্থে শিক্ষিত না হলেও শ্রীশ্রীমা শুধু পড়তে নয়, লিখতেও পারতেন। এছাড়া 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সংগৃহীত মিসেস ওলিবুলকে লেখা শ্রীমায়ের একটি পত্র আছে। পত্রটি স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজীতে লেখা। শ্রীমায়ের জবানীতে চিঠিটি লিখেছেন নিবেদিতা, কিন্তু এই ইংরেজীতে

লেখা চিঠির নিচে বাংলায় বড় বড় অক্ষরে 'মা' কথা লিখে শ্রীমা স্বাক্ষর করেছিলেন। যাই হোক, শ্রীশ্রীমা সেই ত্যাগী সন্তানের কথা শুনে বলছেন-- 'হ্যাঁ বাবা, সর্বধর্মসমন্বয় ঠাকুরের একটি ভাব বটে, কিন্তু ওটিই তাঁর প্রধান ভাব নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান ভাবটি হলো ত্যাগ। ত্যাগ ই ছিল তাঁর ভূষণ। এমন ত্যাগ কে কবে দেখেছে? তবে যে বলছ সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব, হ্যাঁ ওটিও তাঁর ভাব, তবে তিনি মতলব করে সমন্বয়ের ভাব প্রচার করেছিলেন তা আমার মনে হয় না।' বস্তুত, 'অনন্ত ভাবময়' ঠাকুরের প্রধান বা অপ্রধান ভাব বলে কোন কিছু নির্দেশ করা কঠিন কাজ। কিন্তু যদি একান্তই সর্বপ্রধান ভাব বলে কোন ভাবকে নির্দেশ করতে হয় তাহলে শ্রীমায়ের কথা অনুসারে সেই ভাবটি হলো ত্যাগ।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিবছর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে খুব বড় করে 'বিবেকমেলা' র আয়োজন করা হয়। ২০০৩ সালে সেই মেলার উদ্বোধক হিসাবে এসেছিলেন ত্রিপুরার তৎকালীন বামপন্থী সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক অনিল সরকার । ঐ সভায় ত্রিপুরার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হিসেবে আমি ছিলাম সভাপতি। অধ্যাপক সরকার একজন কবিও ছিলেন। অল্পদিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন।। কথাটি আমাকে চমৎকৃত করেছিল। তবে এই কথাটি আমি যে ঐ প্রথমবার শুনেছিলাম এমনটি নয়। ১৯৭৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ গোলপার্ক-এর বিবেকানন্দ হল-এ একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বধর্ম মধ্যে সমন্বয়ের ভাবের প্রবক্তা বললে তাঁকে ছোট করে ফেলা হয়। 'যত মত তত পথ' বলে তিনি যে আদর্শের কথাটি আমাদের সামনে রেখেছেন সেটি সব কিছুর মধ্যে সমন্বয়ের বার্তা দেয়। শুধু সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তা এটি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সব মতকে প্রাধান্য দিতে বলছেন। এটি তো গণতন্ত্রের ভিত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ তো এখানে গণতন্ত্রের আদর্শটির কথাও বলছেন।" ২০০২ সালে আগরতলার সভায় বামপন্থী নেতা, সাহিত্যিক ও ত্রিপুরা সরকারের তৎকালীন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী অধ্যাপক অনিল সরকারের বক্তব্যতেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনলাম। তিনি বললেন, "যাঁরা বলেন 'যত মত তত পথ' বলে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব ধর্মের মিলনের বার্তা দিয়েছেন, তাঁরা সঠিক কথা বলেন না। তাঁর 'যত মত তত পথ' আসলে the voice of democracy-- গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর। সব মতকে, সব পথকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর গানে বলেছেন 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে / নইলে মোদের রাজার সাথে মিলব কি শর্তে'!"

বস্তুত, তলিয়ে দেখলে বুঝব যে, সব ভাবের সমন্বয়ের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন শুধু সর্বধর্মের সমন্বয়ের কথাই নয়। আবার মনে রাখতে হবে যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশি, শ্রীমায়ের ভাবরাশি বা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবরাশি থেকে আলাদা কিছু নয়–সবই একই ভাবের বিভিন্ন বিচ্ছুরণ। তিনজনের ভাবেরই একটি প্রধান বার্তা হলো, মিলনের বার্তা। সর্ব ক্ষেত্রে, সর্ব পথে, সর্ব কর্মে, সর্ব্ব ধর্মে, সর্ব চিন্তায়, সর্ব ভাবে মিলন বা সমন্বয়ের বাণী। এটি আজকের পৃথিবীতে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে সবাই বলছেন-- 'Prophet of Harmony'। তিনি হলেন সমন্বয়ের প্রবক্তা, সমন্বয়ের আচার্য, সমন্বয়ের রূপকার। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর 'যত মত তত পথ' "গণতন্ত্রেরও কণ্ঠস্বর--the voice of democracy-ও।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরণা, স্বামীজী ভাষ্য, শ্রীমা তার প্রয়োগ

আমরা সবাই জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তার ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন প্রেরণা (Inspiration) । প্রেরণা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু খালি প্রেরণা থাকলেই হয় না। সেই প্রেরণার প্রকৃত তাৎপর্যটিও আমাদের বোধগম্য হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া প্রেরণার ব্যাখ্যা (Interpretation) দিয়েছিলেন। এই প্রেরণা ও তার ব্যাখ্যার পরে যেটির প্রয়োজন হয় তা হলো তার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ। জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে প্রেরণা ও তার ব্যাখ্যার কোন তাৎপর্য বা অর্থই থাকে না, বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শ্রীশ্রীমা আমাদের দিয়েছিলেন সেই অতি প্রয়োজনীয় বাস্তবায়নের (Implementation) শিক্ষা। শ্রীমা তাঁর প্রতিদিনের চর্যায়, চর্চায় এবং প্রতিটি কথায় প্রতিমুহূর্তে তা-ই করে গিয়েছিলেন। তাই আমার মনে হয়, প্রেরণা অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার ব্যখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা ও ব্যাখ্যার জীবনে প্রয়োগ। জীবনে রূপায়ন করতে না পারলে উচ্চ আদর্শ ও তার ভাষ্য কোন কাজেই আসবে না। আদর্শটিকে কার্যকরী করতে হবে, জীবনে তাকে ফলিত রূপ দিতে হবে। তবেই আদর্শ ও তার ভাষ্যের সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ ভাবরাশি ও স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যাখ্যার প্রায়োগিক রূপ, ফলিত রূপ বা কার্যকরী রূপ দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে যে, এই ভাবধারার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো যা আগেই বলা হয়েছে--শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব, শ্রীমা সারদাদেবীর ভাব আর স্বামীজীর ভাবের মধ্যে কোনও ফারাক নেই, কোনও বিভাজন নেই, কোনও সংশয় নেই। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রদ্ধেয় লাবণ্য কুমার চক্রবর্তীর একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করতে পারি। সেটি 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সম্ভবত ১৯১৭-১৮ সালের একটি ঘটনার কথা বলা আছে। সেসময়ে আমাদের আশ্রমগুলিতে মন্দিরে শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিই থাকত। খুবই বিরল কিছু আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি থাকলেও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি রাখার রেওয়াজ তখন আরম্ভ হয় নি। এখন যেমন আমরা সব জায়গায়, মঠে-মন্দিরে, আশ্রমে, ভক্তদের বাড়িতে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি একসঙ্গে দেখতে পাই, রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচারের আদিপর্বে এমনটি মোটেও ছিল না। শ্রীশ্রীমায়ের ছবি রাখার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে ১৯৫৪ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসবের সময় থেকে। লাবণ্যবাবু তাঁর লেখায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি একসাথে পূজিত হওয়ার পূর্ববঙ্গের একটি আশ্রমের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে পূর্ববঙ্গের ভক্তদের অনেক অবদান। লাবণ্যবাবু কথিত ঘটনাটি ঠাকুর-মা-স্বামীজীর একসাথে পূজিত হওয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। এই রীতি প্রচলিত হওয়ার পিছনে যে সংশয় ছিল তা হলো--শ্রীরামকৃষ্ণ 'গুরু' আর শ্রীশ্রীমা 'গুরুপত্নী'। তাঁরা দুজনেই আমাদের সনাতন ধর্মের প্রচলিত ভাবনা অনুযায়ী সমমর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। তাই তাঁদের দুজনের ছবি একসাথে বসানো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তো 'শিষ্য'। গুরু আর শিষ্য একসাথে একই আসনে কিভাবে বসবেন? সনাতন রীতিতে এমন অনুমোদন নেই। তারপরে আবার স্বামীজী ছিলেন জন্মসূত্রে অব্রাহ্মণ। সেকালের রক্ষণশীল সমাজে তাই তাঁর ছবি ব্রাহ্মণ গুরুর পাশে বসানোর প্রশ্নই ছিল না। তাই স্বামীজীর ছবি মন্দিরে পূজার আসনে কোথাও থাকত না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ঐ আশ্রমের কর্মকর্তাদের একটি দল স্বামীজীর ছবি ঠাকুরের ছবির সাথে বসিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে ঘোরতর বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং বিষয়টি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সমাধানের জন্য আসে। শ্রীশ্রীমা কিন্ত স্বামীজীর ছবি বসানোর বিষয়টি সানন্দে অনুমোদন করেন। শুধু তাই নয়, শ্রীশ্রীমা ঐসময় বলেন ঃ 'নরেন হলো আমাদের মাথার মণি। ঠাকুরের

আদরের নরেন। যেখানে নরেনের পূজা হয় না, সে-পূজা ঠাকুর গ্রহণ করেন না।' মায়ের অমোঘ বিধানের পরে এবিষয়ে সমস্ত বিতর্কের চিরতরে অবসান হয় এবং ধীরে ধীরে সর্বত্র ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি একসঙ্গে মঠে-আশ্রমে পূজিত হতে শুরু হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের নেতৃত্বহীন নেতৃত্ব

মায়ের ব্যক্তিত্ব এমনই ছিল যে, তাঁর পক্ষে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া বিধানও নাকচ করা সম্ভব ছিল। যদিও শ্রীশ্রীমা তাঁর এই ব্যক্তিত্বকে কখনও জাহির করেননি। কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায় নি। শ্রীশ্রীমায়ের নেতৃত্ব দেওয়ার শৈলীটিকে আমরা বলতে পারি 'নেতৃত্বহীন নেতৃত্ব'। নেতৃত্বের কোনও চিহ্ন নেই। নেতৃত্ব দেবার কোনও সচেতন প্রয়াসই নেই। অথচ তাঁর নেতৃত্ব এমনই নিরঙ্কুশ যে, তার ওপরে কেউ কোনও কথা বলতে পারত না। অথচ অসাধারণ বিনম্রতা ও নিজেকে সরিয়ে রাখার নিরলস প্রয়াস ছিল তাঁর সহজাত। এমন নেতৃত্ব আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও দেখিনি। ভাবতে অবাক লাগে যে, তিনি ছিলেন একটি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘজননী এবং সেই প্রতিষ্ঠানটি আবার একটি সন্ন্যাসীদের সংগঠন যেখানে নারীর কোনও ভুমিকা থাকার কথা নয়। এই প্রতিষ্ঠানের কোনও আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদা তাঁর ছিল না। অথচ তাঁর জীবনকালে সঙ্ঘে সর্ববিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান। তাঁর ওপরে কেউ কোনও কথা বলার সাহস রাখতেন না। সকলেই ছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে নতশির । অথচ সমস্থ কিছুই হতো অবিসংবাদী ও বিতর্কহীন ভাবে। এমন নেতৃত্বহীন নেতৃত্বের আর দ্বিতীয় কোনও উদাহরণ আমরা পৃথিবীতে কোথাও পাই না। সব সময়ে শ্রীমা নিজেকে আড়াল করে রাখতেন, নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। I.A.S, I.P.S প্রভৃতি প্রশিক্ষণে এই 'low profile'-এ থাকার শৈলীটি শেখানো হয়। সাধারণভাবে আমরা দেখি বেশিরভাগ মানুষই নিজেকে জাহির করতে ভালবাসেন, নিজেকে exhibit করতে পছন্দ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে আমরা এই low profile-এ রাখার সর্বোচ্চ ভাবটি দেখি। তিনি কখনও নিজেকে exhibit করতেন না, নিজের ক্ষমতা জাহির করতেন না। সচেতন বা অসচেতন কোন ভাবেই নিজেকে কখনো প্রকাশ করতেন না। মায়ের মধ্যে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি খুবই চোখে পড়ার মতো। ভগিনী নিবেদিতা বলছেন যে, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে শ্রীশ্রীমা যেটি বলবেন সেটিই সর্বোচ্চ আদেশ বলে মান্যতা পায়। কোনও বিষয়ে তিনি কিছু না বললেও সকলে উৎসুক থাকতেন জানতে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কি ইচ্ছা। স্বামী বিবেকানন্দ সহ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সমস্ত প্রধানরাই ব্যগ্র ও ব্যাকুল হয়ে থাকতেন শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা জানবার জন্য। নেপথ্যচারিণী হয়ে কাজের কাজটি করার পদ্ধতিটি শ্রীশ্রীমা আমাদের হাতে-কলমে শেখাচ্ছেন। স্বামীজীর একটি প্রিয় উপমা ছিল 'ভোরের শিশিরবিন্দু'। ভোরবেলায় যে শিশির পড়ে, তার পড়ার শব্দ আমরা কখনো শুনতে পাই না, দেখতেও পাই না তার আগমন কখন কিভাবে হলো। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এলে আমরা দেখতে পাই ঘাসের ডগায় চক চক করছে শিশির, গাছের পাতা থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে শিশিরকণা। তার নিঃশব্দ উপস্থিতি দিয়ে ভোরের শিশির পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলছে, ধরিত্রীকে শ্যামলিমায়, সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলছে।

শ্রীশ্রীমা বলছেন একটু আলগা দিয়ে দূর থেকে সংসারের সবকিছুর দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। এটি যেমন শ্রীশ্রীমায়ের ভাব, তেমনি এটি শ্রীরামকৃষ্ণেরও ভাব, আবার এটি স্বামী বিবেকানন্দেরও ভাব । সবকিছুর মধ্যে সবসময় interfere করা ঠিক না। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মঠ-মিশনের একটি আশ্রমে বড় auditorium রয়েছে। স্টেজের পিছনে কয়েকটি 'ওয়াশরুম' রয়েছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ নির্দেশ দিলেন যে, ওই ওয়াশরুমের বাইরে একটি খাতা ও কলম রাখতে হবে। কেউ ওয়াশরুম ব্যবহার করতে যাবার আগে ওই খাতায়

নাম লিখে যাবে, আবার বাথরুম ব্যবহার করে চলে যাবার আগে ওই খাতায় সই করে যাবে। এতে জলের ব্যবহার এবং সাবানের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই অধ্যক্ষকে চলে যেতে হয়েছিল। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এভাবে নজরদারি করলে কোন কাজ হয় না। পূজনীয় লোকেশ্বরানন্দজীকে দেখতাম, তিনি সব কাজের ভাগ করে দায়িত্ব এক-একজনকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন। এত কাজ চলছে, কিন্তু তাঁর কোনও tension নেই । আমরা অনেককেই দেখি সব সময়েই tension করছেন। নিজে তো অস্থির হয়ে থাকছেনই, আবার আশেপাশের মানুষকেও পাগল করে দিচ্ছেন! এই 'টেনশন' এখন কি ব্যাপক! একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে, বয়স হয়ত চার বা পাঁচ, সেও বলছে, আমার খুব 'টেনশন' হচ্ছে! এই স্ট্রেস ও টেনশন-এর পৃথিবীতে লোকেশ্বরানন্দজীকে দেখতাম সব সময়ে স্থির ও নিরুদ্বেগ হয়ে রয়েছেন। এঁটিই মায়ের শিক্ষা। এটিই শ্রীরামকৃষ্ণভাবের শিক্ষা । এই শান্তভাব স্বামীজীর জীবনের অন্তিম ভাব। তখন তাঁর সব 'মা জানে!' শ্রীশ্রীমা আমাদের শেখাচ্ছেন যে, নিজেকে একটু ছোট করে রাখতে হয়, আর অন্যকে একটু বড় করতে হয়। বেশিরভাগ মানুষকেই আমরা দেখি high profile -এ থাকতে চায়, low profile -এ থাকতে কেউ চায় না। অথচ এটিই শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা। ঠাকুরের শিক্ষাও তাই। স্বামীজীরও তাই। 'নাহং নাহং তুহঁ তুহঁ'-- আমি নই, তুমি, তুমি। অর্থাৎ নম্রতা। নিজেকে 'লো প্রোফাইল'-এ রাখা। জীবনে সফল হওয়ার এই অনবদ্য শিক্ষা জগতকে তাঁরা দিয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণভাবের প্রধান কথা--অন্তশ্চৈতন্যের জাগরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান বার্তা হলো--অন্তশ্চৈতন্যের জাগরণ। আমাদের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে, যে দেবত্বের স্ফুলিঙ্গ আছে, সেটির প্রকাশ ঘটাতে হবে, তার জাগরণ ঘটাতে হবে। অন্তশ্চৈতন্যের বিস্ফোরণ, মহাপ্রকাশ--এটিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একজন মহাবিপ্লবীর সাক্ষাৎকার নেবার। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেছিলেন যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তি সাধারণভাবে অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ । এবিষয়ে কোনও প্রশ্ন বা সংশয় বা সন্দেহ নেই। কিন্ত, তিনি বলেছিলেন, এই মহান ভাববিপ্লবের আসল শক্তি শ্রীমা সারদাদেবী। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তো তাঁকে নিজের 'শক্তি' বলে নির্দেশ করেই গেছেন। অথচ শ্রীশ্রীমা সর্বক্ষণ নিজেকে দুহাত ঘোমটার আড়ালেই রেখেছেন। সাধককবি বলছেন, "রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা, অবগুণ্ঠনে ঢাকা।" সেই মহাবিপ্লবী আমাকে বলেছিলেন--স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু যাঁর কথা তাঁর জীবনকালে কেউ প্রায় জানলই না, তিনি মা। মা-ই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত শক্তি। তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকেও পরিচালনা করতেন জীবনকালে। 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর কথা শুনে চলতেন। 'কথামৃত'-এ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে একটি ঘটনার বর্ণনা পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ঘরে ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের বলছেন যে পুরুষমানুষেরা সবাই তাদের স্ত্রীদের অনুগত, তাদের আঁচলের তলায় তারা থাকে। তারপর তিনি বলছেন--তোমাদের আর কি দোষ দেবো, আমার কথাই দেখ। একদিন এক জায়গায় যাবার জন্য নিমন্ত্রণ এলো। আমি যাবো কি না জানবার জন্য রামলালের খুড়ীর (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমায়ের) কাছে খবর পাঠালাম। রামলালের খুড়ি নহবত থেকে বলে পাঠাল 'যাওয়া হবে নি'। আমারও আর যাওয়া হলো না! অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা এমন একটি ব্যক্তিত্ব যিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকেও চালনা করতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের আরেকটি বিশেষ দিক হলো নারীকে সম্মান জানানো । শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছাকে সর্বদা মর্যাদা দিতেন। এটি স্ত্রীর বশ্যতাস্বীকার নয়-- স্ত্রীকে যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা প্রদান। শ্রীরামকৃষ্ণের

মতো স্ত্রীকে এমন সর্বোচ্চ মর্যাদা দানের দৃষ্টান্ত আরেকটিও কখনো দেখা যাবে না। ষোড়শী পূজার রাত্রে তিনি নিজের স্ত্রীকে পুজা করছেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। এমনকি নিজের জপের মালা, যা কিনা ইষ্টদেবতা ছাড়া কারুর পায়ে দেওযা যায় না, সেটিও তিনি ষোড়শীপূজার শেষে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে সমর্পণ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি যেমন মায়ের মধ্যে তাঁর অন্তর্নিহিত দেবীত্বকে জাগ্রত করেছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সঙ্ঘজননীকেও জাগ্রত করেছিলেন। একই সঙ্গে জগতের 'নারীশক্তির' নবজাগরণও তিনি ঘটিয়েছিলেন।

আমরা সাধারণত 'সাহেব'দের কথার খুব মূল্য দেই। এটি আসলে হীনম্মন্যতাবোধ বা গোলামির ভাব থেকে জাত। । শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। স্বামীজী লিখেছেন, একদিন এক বালক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'গীতা'-র খুব প্রশংসা করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন-- সে 'গীতা'-র এতো প্রশংসা করছে কেন? নিশ্চয়ই কোন সাহেব বলেছে! ম্যাক্সমূলার, ঈশারউড, রোমাঁ রোলাঁ, ক্লড এ্যালান স্টার্ক, আলেকজান্ডার শিফম্যান, আর্নল্ড টয়েনবী, খ্রীস্টোফার ইশারউড প্রমূখ পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইংল্যান্ডের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপিকা বলছেন যে দুশ বছর ধরে আন্দোলন চললেও বিশ্বে নারী জাগরণের আন্দোলনের সাফল্য আসেনি। তার কারণ হলো, এই আন্দোলনের মূল উপকরণটিকে আমরা চিহ্নিত করিনি। তাঁর মতে, এই আন্দোলন তখনই সার্থকতা পাবে যখন আমরা এই আন্দোলনটিকে তার মূল উপাদানটির সাথে যুক্ত করতে পারব। তিনি ভারতবর্ষের অন্ডাল, মীরাবাঈ সহ বেশ কিছু নারীসন্তের নাম করছেন এবং বলছেন এই চরিত্রগুলিকে নারীজাগরণের আন্দোলনের নেতৃত্বের জায়গাতে বসাতে হবে। কিন্ত চমৎকৃত হয়ে দেখি যে, তিনি বলছেন শ্রীমা সারদা দেবীকে এই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তির স্থান দিতে হবে। ভাবার মতোই ঘটনা! যিনি কোনও দিন নিজেকে প্রকাশ করলেন না, পাদপ্রদীপের আলোতে যিনি কোনও দিন এলেন না, তাঁকে নিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদরা গবেষণা করছেন! ইতিহাসকে তো অস্বীকার করা যায় না। চিন্তাশীলরা বলছেন 'নেতৃত্বহীন নেতৃত্ব'-র মূর্ত প্রতীক শ্রীশ্রীমা-ই পারেন বিশ্বের নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলনকে পূর্ণতা ও সার্থকতা দিতে। শ্রীশ্রীমা সামনে আসেন নি, কিন্তু আমাদের সামনে তাঁর বাণী আছে, তাঁর চরিত্রের দ্যুতি আছে। আমাদের জীবনকে আলোকিত করে রয়েছে তাঁর জীবন, তাঁর ভাব, তাঁর চিন্তা ।

'ত্রয়ীর' বাণীতে আছে প্রকৃত বিপ্লবের বীজ

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ হলেন প্রকৃত বিপ্লবী। তাঁদের বিপ্লব অন্তশ্চৈতন্যের বিপ্লব, অন্তর্জাগরণের বিপ্লব। সেই জাগরণই তাঁদের ভাবরাশির প্রধান কথা, প্রধান বার্তা। ১৯৮২ সালের কথা। আমি তখন চৈতন্যাখ্য ব্রহ্মচারী। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে `Religion in the South-East Asia' শীর্ষক একটি সেমিনার হয়েছিল। সেখানে পাকিস্তানের একজন মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ধর্ম একটি প্রধান বিষয়। এখানে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম হলো মৃদু বা নরম স্বভাবের (mild)। খ্রীস্টধর্ম মানুষকে ধর্মান্তরিত করে (prosetytizes) । ইসলাম ধর্ম আক্রমণাত্মক (aggresive)। কিন্তু এই সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 'ভয়ঙ্কর' বা 'বিপজ্জনক'(dangerous) হলো শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম। কারণ, এটি সংক্রামক (infectious)। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম চারিদিকে এখন যেন ভাইরাসের সংক্রমণের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। কারো কোন ভূমিকা ছাড়াই। এ এমনই এক শক্তি যার হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় এ যেন "জাতসাপের ছোবল"। জাতসাপের ছোবল যখন কারুর শরীরে পড়ে

তখন সে নিজে জানতেও হয়তো পারে না। কিন্তু অবধারিত মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে । আমার নিজের কথাই ধরা যাক। যখন আমার দীক্ষা হলো তখন আমি ছাত্র । শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্ট বলে মানতে তো মন চায়নি। মন পড়ে ছিল সেই কালীতে, সেই কৃষ্ণে, সেই শিবে। কেউ তো জোর করে আমাকে তাঁকে মানায়নি। কিন্তু আজ আমার সমস্ত সত্তায় ছড়িয়ে পড়েছেন রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ। কখনো আমার মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি ত্রিশিখা প্রদীপ। কেন্দ্রস্থলে যে শিখাটি সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ, আর তার বামের শিখাটি শ্রীমা, আর ডানের শিখাটি স্বামীজী। আবার কখনো কখনো ভাবি যে, একটি তৈলপূর্ণ প্রদীপ, তার আধারটি শ্রীরামকৃষ্ণ, আধারে যে তেল, সেটি শ্রীমা এবং যে প্রজ্বলিত শিখা জগতের সামনে উর্ধ্বশিখায় জ্বলছে, যার আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে, সেটি স্বামী বিবেকানন্দ। আসলে তিন-এ এক, এবং এক-এ তিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের মূলভাব বিশ্বজনীনতা

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের দিনাজপুর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তৎকালীন আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী অমৃতত্বানন্দজী আমাকে একজন বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। কলকাতা থেকে আমরা বক্তা হিসেবে তিনজনেই একসঙ্গে গিয়েছিলাম। একদিন ছিল ধর্মমহাসভা। সেদিন আমার ভাষণ ছিল হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে। অধ্যাপক হোসেনুর রহমান ছিলেন ইসলামধর্মের প্রতিনিধি। সেদিন ধর্মসভায় একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্মের কথা বলেছিলেন, ঢাকার আর্চবিশপ ছিলেন খ্রীস্টানধর্মের প্রতিনিধি। বহু শ্রোতা সেই সভায় উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে চিলেন ৩০-৪০ শতাংশ মুসলিম ধর্মের মানুষ। প্রাচীনতম ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে আমি ছিলাম প্রথম বক্তা। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তৃতীয় বক্তা ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ। চতুর্থ ও শেষ বক্তা ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধি অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভগবান বুদ্ধের কথা বললেন। ভালই বললেন। আর্চবিশপও ভাল বললেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি ইসলামধর্মের মানুষদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন ঃ"মুসলিমরা অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ। আমি একবার বিদেশ যাচ্ছি। একটি এয়ারবাসে আমাদের যাত্রা। যাত্রীদের মাঝে বরাবর লম্বা দুটি প্যাসেজ এয়ার হোস্টেস এবং যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য। বিমানে মুসলিম যাত্রীরা ঐ প্যাসেজটিতে একটি করে তোয়ালে পেতে নামাজের সময় নামাজ পড়তে শুরু করলেন। যাত্রীরা কে কি ভাবছেন তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁরা তা করে চললেন। তাঁদের এই নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করল। আমরা তো আমাদের প্রার্থনার সময় এই নিষ্ঠা দেখাই না।" আর্চবিশপের ভাষণ শেষ হলে উঠলেন চতুর্থ ও সর্বশেষ প্রতিনিধি অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। তিনি ছিলেন ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত। তিনি প্রথমেই বললেন ঃ " আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় আর্চবিশপ খুব ভালই বলেছেন। কিন্তু তাঁর একটি appreciation সম্পর্কে আমি সহমত পোষণ করতে পারছি না। তিনি বললেন মুসলমানদের ধর্মনিষ্ঠা ওঁকে মুগ্ধ করেছে এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি তাঁর সহ-বিমানযাত্রীদের বিমানের যাতায়াতের প্যাসেজের মধ্যে তোয়ালে পেতে নামাজের সময় নামাজ পড়ার বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। নামাজ পড়ার সময় নিষ্ঠা খুবই ভাল, কিন্তু যাতায়াতের প্যাসেজের মাঝখানে নামাজ পড়লে এয়ারহোস্টেস ও যাত্রীদের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করাটা একটি গর্হিত অপরাধ বলে আমার মনে হয়। আমি থাকলে আমি তাতে বাধা দিতাম। কারণ কত অসুস্থ ও বৃদ্ধ যাত্রী এবং এয়ারহোস্টেসরা ঐ সময় প্রয়োজনে প্যাসেজটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের কর্তব্যপালন এবং ন্যায্য অধিকারে তো আমরা কেউ বাধা দিতে পারি না। নামাজ আমার ব্যাক্তিগত ধর্মীয় আচার, কিন্তু বিমানে অন্য যেসকল অমুসলিম যাত্রী ছিলেন তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও প্রয়োজনকে আমি আমার গায়ের জোড়ে বাধা দিতে

পারি কি ? এয়ারহোস্টেসদের কর্তব্যপালনেও কারও কি বাধা সৃষ্টি করার অধিকার আছে? না, নেই। ইসলামও এর বিরোধী।" নিজে মুসলমান হয়ে একটি মুসলিম দেশে এমন মন্তব্য করার সাহস তিনি কিভাবে পেলেন ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, আবার অধ্যাপক রহমানের বক্তব্যের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে আমি এবং অন্যান্যরা উদ্বিগ্নও হচ্ছিলাম। সেখানে আশীর্বাণী দেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তাঁর মুখেও দেখলাম উদ্বেগের ছায়া। কিন্তু সহস্রাধিক মানুষ যাদের ৩০/৪০ শতাংশ সম্ভবত মুসলিম, তাঁরা সবাই নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনছিলেন। আমার আসন ছিল অধ্যাপক রহমানের পাশে। ওঁর ভাষণ শেষ হলে ওঁকে বললাম ঃ "আপনি কথাগুলিতো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এমন কথা এদেশে এবং এমন একটি সমাবেশে বলার সাহস পেলেন কিভাবে?" তিনি বললেনঃ "সাহসের কথা আসছে কেন? আমি কি অন্যায় ,অসত্য কিছু বলেছি?" আমি বললামঃ "না, কথাগুলি তো আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এদেশে একথা বলতে তো সাহস লাগেই।" তিনি বললেন ঃ"আমি তো মনে করি না। তবে সত্যি কথা বলতে যদি সাহস লাগে , তবে সেই সাহস আমাকে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দ। সত্যকে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে বলার সাহস তাঁদের জীবন থেকেই পেয়েছি।" তাঁর ভাষণের শেষের দিকে তিনি আরেকটি বৈপ্লবিক কথা বলেছিলেন ঃ "এবার আমি একটি কথা বলব, যে কথা আমি একজন বক্তা হিসেবে বলতে চাই না, বলতে চাই একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে। আমি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সরকারী কলেজে ইতিহাস পড়িয়েছি। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের ভিত্তিতে আমার মনে হয়েছে, অনাগত ভবিষ্যতে একটি সময় আসবে যখন পৃথিবীর মানুষ সম্প্রদায়গত ধর্মে আর বিশ্বাস রাখতে পারবে না। কিন্তু ধর্ম কখনোই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে না। সম্প্রদায়গত ধর্মে বিশ্বাস ও আস্থা-হীন অনাগত ভবিষ্যতেও ধর্ম থাকবে। কিন্তু তখন পৃথিবীতে কোন্ ধর্ম থাকবে? ধর্মহীন হলে তো মানুষ অরণ্যের পশুর সমান হয়ে যাবে। তাই ধর্ম তখনো থাকবে। কিন্তু সেই ধর্মের চেহারা কি হবে? ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে বলছি, আগামী দিনের পৃথিবীর ধর্ম হবে 'বেদান্ত'। বেদান্ত শুধু হিন্দুর নয়, বেদান্ত সকলের। বেদান্ত কোন জাতিকে , কোন ধর্মকে, কোন দেশকে, কোন সম্প্রদায়কে মান্যতা দেয় না, কারও কোন বিশেষ অধিকারকেও স্বীকার করে না। বেদান্ত সর্বজনীন। এখন প্রশ্ন হলো---ধর্মহীন যেমন পৃথিবী থাকতে পারে না, তেমনি ধর্মগ্রন্থহীন পৃথিবীও কি থাকবে ? না, থাকতে পারবে না। মনে রাখবেন ভবিষ্যতে কোন সম্প্রদায় যেমন থাকবে না, তেমনি কোন সম্প্রদায়গত ধর্মগ্রন্থও থাকবে না। অর্থাৎ হিন্দুদের বেদ থাকবে না। বৌদ্ধদের ত্রিপিটক থাকবে না। খ্রীস্টানদের বাইবেল থাকবে না। আমি মুসলমান হয়েও বলছি, মুসলমানদের কোরানও থাকবে না। কিন্তু ধর্মহীন পৃথিবী যেমন থাকবে না, তেমনি ধর্মগ্রন্থহীন পৃথিবীও থাকতে পারে না। কিন্তু কি হবে ভবিষ্যতের নিখিল মানুষের ধর্মগ্রন্থ? শুনে রাখুন, ভবিষ্যতের পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থ হবে-'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।' সেখানে বেদ আছে, বাইবেল আছে, ত্রিপিটক আছে, কোরান আছে। আছে তাদের সকলের নির্যাস, সকলের সারাংশ, সকলের বার্তা। নজরুল লিখেছেন 'তব কথামৃত কলির নব বেদ।' 'রামকৃষ্ণকথামৃত' কলির নতুন বেদ, নতুন শাস্ত্র, নতুন ধর্মগ্রন্থ। 'কথামৃত' নতুন যুগের নতুন বেদ, নতুন ধর্মগ্রন্থ।" সেদিন ধর্মমহাসভা শেষ হলো। সহস্রাধিক মানুষ নীরবে নিঃশব্দে সভাস্থল ত্যাগ করল। সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ। সবাই যেন একটা আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট। এই নীরবতা যেন ঐ সভার বার্তা। সেই বার্তা শ্রীরামকৃষ্ণের, শ্রীমায়ের এবং স্বামী বিবেকানন্দের। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর তিনটি ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনটি ছবি ধ্যানমগ্নতার ছবি। তিনটি ছবিই মৌন। সত্যিই কি মৌন? না মৌনমুখর ? মৌন হয়েও এমন বাঙ্ময়, এমন মুখর তাঁরা ছাড়া আর কে-

ই বা হতে পারে ? অধ্যাপক রহমানের ভাষণ এমন আকর্ষণীয় ছিল যে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন তাঁর কথা। সামান্য কোন প্রতিবাদ বা বিরোধী কণ্ঠস্বরও শোনা যায়নি। সত্যের কণ্ঠস্বর এমনই হয় নিশ্চয়ই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সবকিছুই ছিল সুন্দর। তাঁর কথা সুন্দর, তাঁর অবয়ব সুন্দর, তাঁর গান সুন্দর, তাঁর ভজন-কীর্তনানন্দের নৃত্য সুন্দর। ব্রাহ্ম পত্রপত্রিকায় তাঁর অসাধারণ সুকণ্ঠের পাশাপাশি তাঁর অপরূপ নৃত্য ও নৃত্য-ভঙ্গিমার সমুচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর প্রতিটি কাজ ছিল অত্যন্ত রুচিসম্মত, পারিপাট্টে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শ্রশ্রীমাকে তিনি গৃহস্থালীর কাজ কিভাবে সুন্দরভাবে ও পরিপাটির সঙ্গে করতে হবে তা সযত্নে শিখিয়েছিলেন। কেমন করে প্রদীপের সলতে পাকাতে হয় যাতে সলতের মধ্যে কোন গিঁট না থাকে---বেশি তেল পুড়বে না অথচ রাতভর জ্বলবে, কেমন করে ঘর ঝাঁট দিতে হয়, কেমন করে কোন্ রান্নার সবজি কিভাবে কিভাবে কাটতে হয়, কোন্ ব্যঞ্জনে কোন্ মশলা দিতে হয়, কেমন করে পান সাজতে হয়, কেমন করে গুরুজন, আত্মীয়-পরিজন ও অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, ইত্যাদি সব শিখিয়েছিলেন। 'প্রতিটি কাজ যেন পূজা' সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিভাবে কাজ করতে হবে, কিভাবে দোকানে বা বাজারে জিনিসপত্রের দরদাম করতে হয়, ভক্তিভাবের আধিক্যে যেন ঠকতে না হয়--সব তিনি শিখিয়েছেন। তাঁর একটি বড় শিক্ষা ছিল-'ভক্ত হবে কিন্তু বোকা হবে কেন ?' তাঁর ঘরে ছেলেদের জন্য ফল কাটার ছুরি থাকত। তিনি ছেলেদের শেখাতেন, এমনভাবে ছুরিটি রাখতে যাতে রাতের অন্ধকারেও প্রয়োজনে ছুরিটি নিতে পারবে--ধারালো দিকটা পিছনে থাকবে বাঁটের দিকটা সামনে থাকবে। তাঁর শিক্ষা ছিল একহাতে ভগবানকে অর্থাৎ ধর্মকে ধরা আর অন্য হাতে সংসারের কাজ করা। জীবনের কোন কাজ, কোন অভিজ্ঞতাই উপেক্ষার নয়। সবকিছুর গুরুত্ব আছে। এমনভাবে জীবন ও জগতকে আগে কেউ দেখেছেন বা দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এমন একটি সামগ্রিক বা holistic বা comprehensive দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া সত্যি দুষ্কর। শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন বা করেছেন, তাঁর সহধর্মিণী এবং তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন তার প্রতিরূপ। বস্তুত, তাঁর সমস্ত ত্যাগী পার্ষদ সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। শ্রীমার জীবন যেন একটি অনবদ্য শিল্প। তিনি বলতেন ঃ প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হয়। ঝাঁটাটিরও একটি মর্যাদা আছে। সেটিও গৃহস্থালির একটি অঙ্গ। আজকের কাজ শেষ হলে কাল আবার সেটি লাগবে। সুতরাং কাজ শেষ হয়ে গেলে তাকে দূরে উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় ছুড়ে ফেলে দিতে নেই। ভক্তদের প্রসাদ পাওয়ার সময় বসার আসন এবং খাওয়ার পাতা এলোমেলোভাবে যেন পাতা না হয়, পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যেন পাতা হয়। বস্তুত, তাঁর ছিল এক অসাধারণ জীবনশৈলী। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শ্রীমা তা শিখেছিলেন। শিখেছিলেন ঃ "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" এমন সামগ্রিক জীবনশৈলী ও জীবনদর্শন আর কোথায় পাব ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যত্র জীব তত্র শিব", শ্রীমা বলতেনঃ "জ্ঞান হলে কি আর মাথায় দুটো শিঙ গজায়? তখন জ্ঞান চৈতন্য লাভ হয়। সাধন করতে করতে দেখবে তোমার মধ্যে যিনি দুলে বাগদী ডোমের মধ্যেও তিনি। সকলের মধ্যেই তিনি।",স্বামীজী বললেনঃ "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" সেবাই এবার যুগধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন আমাদের প্রতিটি কাজ যেন নিখুঁত হয়, কারণ কোন কাজই ছোট বা উপেক্ষার নয়। স্বামীজীর বিখ্যাত কথা--"Work is worship কর্মই উপাসনা। " সুতরাং শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন এবং কর্ম ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কর্মের সম্প্রসারণ এবং ব্যাখ্যা।

উপসংহার

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী একে অপরের পরিপূরক। প্রত্যেকেই এক-একটি সম্পূর্ণ জীবন, অথচ একে অন্যের কী অসামান্য পরিপূরক! গুরু, গুরুপত্নী ও শিষ্যের এমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং এমন এক সুরে বাঁধা সুরমূর্ছণা বাস্তবিকই বিরল। কখনো কখনো আমার মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি বিশুদ্ধ রাগ বা রাগিনী। স্বামীজী যেন তার স্বরলিপি এবং শ্রীমা যেন রাগ বা রাগিণীর পরিবেশিত রূপ। কিভাবে এমন পারস্পারিক সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হলো তা আমাদের বিস্ময়। তবে আমাদের মনে হয়, শুধু ধর্ম নয়, ধর্মের মর্মকে তাঁরা তাঁদের জীবনে জীবন্ত করেছিলেন বলে এমনটি সম্ভব হতে পেরেছিল। বস্তুত, ধর্মই জীবনকে ধারণ করে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, ধর্মমত নয়, ধর্মের মর্ম যখন জীবনে অনুসৃত হয় তখন এমনটিই হয়। স্বামীজীর একটি কথা মনে পড়েঃ"Religion is of course a journey, a pilgrimage. ধর্ম অবশ্যই একটি যাত্রা, একটি তীর্থযাত্রা। But it is never a journey from Calcatta to Kedarnath, it is a journey from the brute-man to the Buddha-man." কিন্তু সেই যাত্রা বা তীর্থযাত্রা কলকাতা থেকে কেদারনাথ যাত্রা নয়। সেই তীর্থযাত্রা হলো পশুমানব থেকে বুদ্ধমানবের পথে যাত্রা।

বস্তুত, এই পশুমানব থেকে বুদ্ধমানব হওয়া এবং হয়ে ওঠাই ধর্ম ও জীবনের লক্ষ্য। ঠাকুর-মা-স্বামীজী তা-ই শিখিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন। তাঁদের জীবন যেন এক মহাবিপ্লবের ইতিবৃত্ত। যে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি হলো মানুষের উদ্বোধন, উত্তোলন এবং উত্তরণ। সেই অর্থে তাঁরা এবং তাঁদের মতো মানুরাই পৃথিবীতে সত্যিকারের বিপ্লবকে মূর্ত করে তোলেন। পৃথিবীবিখ্যাত ঐতিহাসিক দম্পত্তি উইল ও এরিয়েল ডুর‍্যাল্টের কথায় তারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি ঃ "The only real revolution is in the enlightenment of the mind and the improvement of charecter, the only real emancipation is individual, and the only real revolutionists are philosophers and saints." (প্রকৃত বিপ্লব হলো মানুষের মনের আলোকপ্রাপ্তি এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। এটিই মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং প্রকৃত বিপ্লবী হলেন দার্শনিক ও সন্ত-সাধকবৃন্দ।)

---

*গত ২রা ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কলকাতা সল্টলেক স্থিত রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে 'মা সারদা পাঠমন্দির' আয়োজিত বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।